The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp. 177 - 182)
Published in February, 2025

ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন

নীলকান্ত বিশ্বাস *

প্রতিপাদ্যসার: প্রাচীন ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্র। নাট্যশাস্ত্র শুধু নাটকের নয়- অভিনয়শিল্প, নৃত্য, সংগীত ও অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কেও প্রামাণিক গ্রন্থ। পরবর্তী বিভিন্ন অলঙ্কারশাস্ত্রের মূল উৎস। আধুনিক নাট্যশিল্পের ক্রমবিকাশের এই যুগে অসংখ্য নাট্যানুরাগী রয়েছেন যারা নাট্যশাস্ত্রের অনুরাগী। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্যরূপে নির্বাচিত। এছাড়া দেশের ফিল্ম ইনস্টিট্যুটগুলিতেও পাঠ্যসূচির অন্তর্গত। নাট্যশাস্ত্র সর্ববিধ প্রয়োগ কলারও উৎসভূমি। প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার উৎপত্তি কখন হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ঋগ্বেদের সংবাদ বা আখ্যান সূত্রগুলিতে যে কথোপকথন আছে তা থেকেই নাটকের ধারণা জন্মেছিল। ভারতীয় নাট্যকলার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব উল্লেখযোগ্য। আদি নাট্যকার ভরতমুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের বিবরণে নাট্যকলার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, কাল, বিবর্তনধারা, নাট্য শ্রেণিভাগ, রস, বৃত্তি, লক্ষণ, অলঙ্কার, প্রকরণ, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ আলোচনা রয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের এসব উপকরণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির চিত্র ফুঁটে উঠেছে ও নাট্যশাস্ত্রের মূল্যও নিরূপিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা: সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রাচীনতম এবং অতীব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮)। মূলত নাট্যতত্ত্ব (অভিনয়, গীত, বাদ্য ও নৃত্য) সম্পর্কিত প্রাচীন পণ্ডিতদের বিবিধ তত্ত্ব ও আলোচনার সংকলন এই নাট্যশাস্ত্র। নাটক ও নাট্যতত্ত্ব এর প্রধান আলোচ্য হলেও ব্যাপকার্থে কাব্য বা সাহিত্যকে এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ৭-৮)। কাব্যের প্রধান দুই ভেদ: ১. দৃশ্য কাব্য ও ২. শ্রব্য কাব্য। শ্রব্য কাব্য অর্থাৎ নাট্যভিন্ন অন্যান্য গদ্য, পদ্য ও মিশ্র কাব্য। নাট্যে যেহেতু গদ্য ও পদ্য উভয়ই প্রযুক্ত এবং সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ আদর্শ নাট্যরচনায় নাট্যশাস্ত্রের আলোচ্য। এরূপ রচনার দোষ, গুণ অলঙ্কার এবং অন্যান্য গুণমান এর আলোচ্য (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০০)। তাই প্রসঙ্গক্রমে নাট্যশাস্ত্রে ১০টি গুণ ও ৪টি অলঙ্কার (উপমা, দীপক, রূপক ও সমক) আলোচিত। প্রথম তিনটি অলঙ্কার সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারের প্রতিনিধি এবং শেষোক্ত যমক শব্দালঙ্কারের প্রতিনিধি (ভট্টাচার্য ১৯-২০)।

ভরতমুনি পরিচয়: ভরত মুনি ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় নাট্য ও সংগীত বিশারদ। ভরতমুনি প্রাচীন ভারতের নাটক, বিশেষ করে সংস্কৃত মঞ্চ নাটক রচনা করেছেন। একই সাথে অভিনয় বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্র রচনার সঠিক কাল এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে, বিভিন্ন পণ্ডিতগণের অনুমানের ভিত্তিতে ধারণা করা যেতে পারে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে নাট্যশাস্ত্র রচনা করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য ও সংগীতের মূল পাওয়া যায় নাটকে (প্রজ্ঞানানন্দ ২০৯-২১০)। ভরতমুনি অভিনয়ের তিনটি রূপের উল্লেখ করে বলেন, তামিল নাটকের উল্লেখযোগ্য অংশ হলো ধ্রুপদী ভারতীয় সংগীত ও নৃত্য। তিনি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের দশটি গুণের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে নাটক হলো একটি। এছাড়াও ভরতমুনি কিছু রস ও অভিব্যক্তির বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যেগুলি ভারতীয় নৃত্য, সংগীত ও মঞ্চনাটকের নানা বিষয় বর্ণনা করেছেন। ভরতমুনি ভরতনাট্যম নৃত্যধারার সৃষ্টিকারক হিসেবে মনে করা হয়। পুরাণ সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নৃত্যকলার দেবতা নটরাজ এই নৃত্যধারা সৃষ্টি করেছেন (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০১-৩০২)।

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বস্তু: ভরতমুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্র সংস্কৃত সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। মহর্ষি ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের মোট ৩৬টি অধ্যায় (প্রজ্ঞানানন্দ ২১২)। অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু দেওয়া হলো:

প্রথম অধ্যায়: এই অধ্যায়ে নাট্যবেদের উৎপত্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নাট্যকাব্যের বিভিন্ন অঙ্গের অঙ্গগুলি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মঞ্চে নাটক কিভাবে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন সেই সকল বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদ হতে বাণী, সামবেদ হতে সংগীত, যজুর্বেদ হতে অভিনয় এবং অথর্ববেদ হতে রস গ্রহণ করে এই পঞ্চম বেদ রচনা করেন (বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০)।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বিভিন্ন প্রকারের রঙ্গালয়ের বর্ণনা, মর্ত্যবাসীর জন্য রঙ্গালয়, রঙ্গালয়ের সুবিধা অসুবিধা বিষয়ে, সঠিক স্থান নির্বাচন, জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ, নান্দী অনুষ্ঠান, রঙ্গালয়ে স্তম্ভ নির্মাণ, রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ, রঙ্গমঞ্চের কারুকার্য ইত্যাদি বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে (প্রজ্ঞানানন্দ ২১৭-২১৮)।

তৃতীয় অধ্যায়: রঙ্গালয় সংস্কারের নানা বিধান, দেবপ্রতিষ্ঠা, রঙ্গদেবতা পূজা, ঘটভাঙ্গার নিয়ম, রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন রকমের আলোকসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ সংস্কারের ফলে বিভিন্ন রকমের সুফল, আবার অনেক সময় রঙ্গমঞ্চ সংস্কার সঠিক সময়ে করা না হলে নানা রকমের কুফল দেখা দিতে পারে সে সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, রঙ্গমঞ্চে মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, গুহক, এই সকল দেবতাগণের পূজা করা হয় এবং নাট্যানুষ্ঠানের জন্য তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২)।

চতুর্থ অধ্যায়: ব্রহ্মার দ্বারা প্রথম নাট্যগ্রন্থ আরম্ভ, একই সাথে অভিনয় বিষয়ে ধারণা, দুই প্রকারের পূর্বরঙ্গ বিষয়ে আলোচনা, সাত অথবা ততোধিক কারণের সমাহার রমণীদের লীলায়িত নৃত্যভঙ্গি অর্থাৎ লাস্য নৃত্য নিষিদ্ধ উপলক্ষ্য, বাদ্যযন্ত্র বাদন, বাদ্যযন্ত্র বাদনের নিষিদ্ধকাল সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ে দুইটি নাটক অভিনয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'অমৃতমন্থন' নাটকটি দেবগণের সম্মুখে এবং 'ত্রিপুরদাহ' নাটকটি মহাদেবের সম্মুখে অভিনীত হয় এই বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪)।

পঞ্চম অধ্যায়: পূর্বরঙ্গ, অবতরণ, শুরু, বজ্রপাণি, সংঘোটনা, গীতবিধি, উত্থাপন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন, পূর্বরঙ্গ, রঙ্গদ্বার, মহাচারী, চারী, তিন প্রকার রঙ্গ বিষয়ে আলোচনা, বর্ণ, দেবতা প্রভৃতি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, পূর্বরঙ্গ, নান্দী ও প্রস্তাবনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪)।

ষষ্ঠ অধ্যায়: নিরুক্তের সংজ্ঞা, কারিকার সংজ্ঞা, অভিনয়ের প্রকারভেদের মধ্যে চার প্রকার অভিনয়ের বর্ণনা, আট প্রকার রস সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা: হাস্যরস, করুণরস, রৌদ্ররস, ভয়ানকরস, বীররস, বীভৎস রস, অদ্ভুতরস, শৃঙ্গাররস। তিন প্রকার রঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এই অধ্যায়ে রস বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩)। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভরত বলেছেন 'রসস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ।' তারপর রসভাব, অভিনয়, ধর্মীয় বৃত্তি, প্রবৃত্তি সিদ্ধি, স্বর, গান ও রঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । আট প্রকার রসের কথা ভরত মুনি নিজেও স্বীকার করেছেন। রসের অভিব্যক্তি কি করে হয় তা বলতে গিয়ে ভরত মুনি বলেছেন 'বিভানুভ্যাবাভিচারি সংযোগাদ্ রসনিস্পত্তিঃ প্রবর্ততে।' তবে উল্লেখ্য যে ভরত মুনি আট প্রকার রসের কথা বললেও কোনো কোনো স্থানে নবম রস হিসেবে শান্ত রসের নাম পাওয়া যায়। কবিচিত্তের রসানুভূতি থেকে কাব্যের উদ্ভব, সামাজিক চিত্তের রসানুভূতি থেকে কাব্যের উদ্ভব, সামাজিক চিত্তের রসানুভূতিতে কাব্যের পর্যাবসান। যেমন 'বীজ থেকে বৃক্ষ, বৃক্ষ থেকে পুষ্প, পুষ্প থেকে ফল' হয়। অর্থাৎ বীজ থেকেই সব কিছুই হয়। তেমনি ভাবেই দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্যের বেলায়ও রসই মূল । তাই তো ভরতমুনি বলেছেন, যথা:

'বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ' (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩-১৩৬)।

সপ্তম অধ্যায়: ভাবের সংজ্ঞা, বিভাবের সংজ্ঞা, রতি, হাস, ক্রোধ, ভয়, বিস্ময়, গ্লানি, শংকা, চিন্তা, মোহ, ধৃতি, চপলতা, আবেগ, গর্ব, বিষাদ, মতি, বিতর্ক, সাত্ত্বিক, রোমাঞ্চ প্রভৃতি বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৮)। এক কথায় বলা যেতে পারে এই অধ্যায়ে ভাব, বিভাব, স্থায়ী ভাব, ব্যভিচারী ভাব ও সেই সঙ্গে আট প্রকার স্থায়ীভাব বর্ণনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়: অভিনয় শব্দের সম্যক ধারণা দেয়া, চার প্রকার অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা, ছত্রিশ প্রকার দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা, সঞ্চারিতভাবে দৃষ্টি, স্থায়ীভাবে দৃষ্টি, দৃষ্টিভেদ, নাসিকা, চিবুক, মুখক্রিয়া, অধর প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে এই অধ্যায়ে চার প্রকার অভিনয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

'আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।
চত্বারোহভিনয়া হ্যেতে বিজ্ঞেয়া নাট্যসংশ্রয়াঃ।'

নবম অধ্যায়: নবম অধ্যায়ে রসভাবাদি অনুসারে হস্ত পদ প্রভৃতির বহুপ্রকার বিক্ষেপ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩-৪৪)।
দশম অধ্যায়: এই অধ্যায়ে অঙ্গসমূহের বিবিধ নিক্ষেপ ও তাদের নামকরণ বর্ণনা করা হয়েছে (প্রজ্ঞানানন্দ ২১৫)।

একাদশ অধ্যায় থেকে ষোড়শ অধ্যায়: ১৬ প্রকার চারী বা বিভিন্ন পাদ সংক্রমণ লক্ষণ সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে। মণ্ডপের লক্ষণ ও সংখ্যা কত হবে সেই সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা অভিনয় করেন অর্থাৎ অভিনেতাগণের যথাযথ চালচলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নাট্যমণ্ডপের স্থান বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৭-১৪৮)। বাচিক অভিনয় সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নাট্যে ব্যবহৃত বৃত্ত বা চন্দ্রসমূহ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯)।

অলঙ্কারশাস্ত্রে নাট্যশাস্ত্রের অবদান: অলঙ্কারশাস্ত্রের আদি ভরতমুনি এখনও পর্যন্ত সকল পণ্ডিতবর্গের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছেন। কৃগ্নাশ্ব, শিলালিন নটসূত্রের পাণিনির ব্যাকরণ স্বীকৃত হলেও তাঁদের গ্রন্থ অবলুপ্ত। নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতারূপে ভরতের পূর্ববর্তী কাশ্যপ কোথাও কোথাও উল্লিখিত হয়েছেন। ভরতমুনির নিজস্ব উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'অত্র আনুবাংশৌ শ্লোকে ভবতঃ।' নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে তার পূর্বকাল থেকেই ভারতবর্ষে নাট্যশাস্ত্রের প্রচলন ছিল (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৫)। আলঙ্কারিক রাজশেখরের মতে ভরতমুনিই রূপক বা দৃশ্যকাব্যের আদি স্রষ্টা। "রূপক নিরূপনীয়ং ভরতঃ।" ভরত ৬০০০ শ্লোকে তাঁর নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন। নাট্যশাস্ত্রের ৩৬ টি অধ্যায় বর্তমানে পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্র কারিকা, গদ্যাংশ, সূত্রভাষ্য এবং আর্যা ও অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। তাঁর নাট্যশাস্ত্রকে ভারতীয় ললিতকলার 'বিশ্বকোষ' বলা হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ১০-১১)।

ভারতীয় নাট্যকলায় ভারতীয় সংস্কৃতির উপাদান: এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য নাট্যকলা হলেও এতে নৃত্য, গীত ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এতে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বহু তথ্য পাওয়া যায়। এই সকল তথ্যের সন্নিবেশ নিতান্ত আকস্মিক নয়। নাট্যকলা সংক্রান্ত এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব রয়েছে।

ভারতীয় নাট্যকার, কবি ও আলঙ্কারিকদের মধ্যে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব: ভারতীয় সমাজের কাব্যকারদের মধ্যে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল তা উদাহরণের মাধ্যমেই প্রমাণ করা যেতে পারে।

কালিদাস: কালিদাসের কাব্যে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নিয়মের অনুসরণ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। 'কুমারসম্ভবে' শিব পার্বতী তাঁদের বিবাহ উপলক্ষে নাট্যানুষ্ঠান দেখেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। এতে বিভিন্ন বৃত্তি ও সন্ধির সংযোগের কথা আছে। সংগীত রসানুসারী ছিল বলে উক্ত হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৬)।

বিশাখ দত্ত: বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে রাক্ষস রাজনৈতিক সংহতিকে নাট্যকারের কাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং নাট্যগ্রন্থের বর্ণনা করেছেন। এ ধারণা নাট্যশাস্ত্র প্রভাবিত মনে হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩২)।

ভবভূতি ও মুরারি: ভবভূতি 'মালতীমাধব' ও মুরারির 'অনর্ঘরাঘব' এই শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ ও বিধির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে সহজেই মনে করা হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২৫)।

পণ্ডিতপ্রবর কীথ্ এর উক্তি: পণ্ডিতপ্রবর কীথ্ যথার্থই বলেছেন যে, পরবর্তীকালের যে নাট্যগ্রন্থের কোন নতুন আকার সৃষ্ট হয় নাই নাট্যশাস্ত্রের প্রভাবে। এই শাস্ত্রকে কয়েক প্রকারের নাট্যগ্রন্থ হিসেবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তার বাহিরে কেউ যায় নি বা যেতে সাহস পান নি। সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ যে বিয়োগান্তক নয়, তা নাট্যশাস্ত্রের প্রভাবপ্রসূত বলে মনে হয়। ঐ গ্রন্থে এরূপ রচনা যে নিষিদ্ধ তা পূর্বে লক্ষ্য করা গিয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৬)।

শার্ঙ্গদেব: শাঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকরে' বিশেষত এর নর্তনাধ্যায় এ নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব স্পষ্ট। শাঙ্গদেব ভরতের নামোল্লেখও করেছেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্য, নাট্য, গীত প্রভৃতির আলোচনায় ও বিশ্লেষণে নানা ভাষা, বিবিধ আচার ব্যবহার, বেশভূষা, মানসিকতা প্রভৃতির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ স্বাভাবিক (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯-২০)।

ভাষা: ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চদশ অধ্যায় ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে যথাক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এই বিবরণ থেকে সেকালে এই ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪)। ধ্রুবাসমূহে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষার নিদর্শন এই ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান। 'বর্বর, কিরাত, অন্ধ্র, শবর ও চণ্ডাল' প্রভৃতি জাতির ভাষা কিরূপ ছিল তা জানা যায় (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১-৩২)। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার প্রধান লক্ষণ গুলিও সূচিত হয়েছে যেমন: 'গঙ্গা ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলের ভাষা এ- কারবহুল, বিন্দ্যপর্বত ও সমুদ্রের অন্তবর্তী ভাষা ন- কারবহুল ইত্যাদি' (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩-৩৫)।

বেশভূষা: বেশভূষা প্রসঙ্গে তথ্য এর জন্য এই গ্রন্থ অপরিহার্য। কারণ এক প্রকার অভিনয়ের নামই আহার্য। অর্থাৎ যা সাজপোশাকের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন অঞ্চলের নারীগণের কেশবিন্যাস, যন্ত্রাদির রং সম্বন্ধে পছন্দ- অপছন্দ, নারী- পুরুষের ব্যবহৃত আভরণ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে আছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০)।

রঙ্গালয়: রঙ্গালয় ত্রিবিধ। বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও এ্যস্র। আয়তন অনুসারে রঙ্গালয় তিন প্রকার - জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও অবর। এদের দৈর্ঘ্য, হাত ও দণ্ড অনুসারে যথাক্রমে: ১০৮, ৬৪ ও ৩২ রঙ্গালয়, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি নির্মান পদ্ধতি থেকে ঐ যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যা সম্পর্কে জানা যায়। এমনটি আজও কতক রঙ্গালয় তৈরি করা হয় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত পরিমাপ অনুযায়ী (চৌধুরী ২১)।

অভিনেতা: উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে অভিনেতা ছিলেন তিন প্রকারের। নাট্যশাস্ত্র কি রকম লোকের কি রকম ভূমিকা হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ করেন। অভিনেতার পোশাক নিয়েও নাট্যশাস্ত্র সতর্ক। প্রাসঙ্গিক রসের অনুকূল রং আবশ্যক। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অভিনেতার এই বিভেদ সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫)।

কারুশিল্প: নাট্যশাস্ত্রে 'পুস্ত' শব্দে রঙ্গমঞ্চে ব্যবহার করা অভিনয়ের সহায়ক কিছু পদার্থকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার পুস্তের বর্ণনা থেকে সেই সময়ের কারুশিল্প সম্পর্কে ধারণা করা যায় (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪-৩৫)। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় রঙ্গমঞ্চে ব্যবহার্য অস্ত্র শস্ত্র কঠিন উপাদানে নির্মিত হবে না। ভারী অস্ত্র- শস্ত্র এর পরিবর্তে গুল্ম জাতীয় ঘাস, বাঁশ ব্যবহার করতে হবে (বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৯)।

মনস্তাত্ত্বিক বিষয়: ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নাট্যরচনায় ও অভিনয়ে মনোবিদ্যার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। উক্ত রস প্রসঙ্গে ভাবাদির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে। নায়িকাগণের শ্রেণি বিভাগ, তাঁদের মানসিক অবস্থার উল্লেখ প্রভৃতিতে নাট্যশাস্ত্র মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থাকারের যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় আছে। প্রেক্ষক, অভিনেতা, সমালোচক প্রভৃতির বিবরণে গ্রন্থাকার সূক্ষ্ম রুচি ও বিচার বিশ্লেষণে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। এই বিষয়ে নাট্যশাস্ত্র সংশ্লিষ্ট যুগের দর্পণ স্বরূপ (বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬-২৮)।

কামকলা ও ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব: নাট্যশাস্ত্রে বিশেষত পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে নানা তথ্য আছে। কামসূত্রে এই বিষয়ে যে তথ্য আছে নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা যেন তার পরিপূরক (নন্দী ২৮)।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য: নাট্যশাস্ত্রের প্রণেতা নাট্যের অবাধ অভিনয়ের জন্য নাট্যমণ্ডপ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন কলা কৌশলের ব্যবহার ও প্রয়োগ করেছেন। সেখানে রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গশীর্ষ, রঙ্গালয় প্রভৃতির জন্য নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এ থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় তখনকার সময়ের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এবং চিত্রকলাবিদ্যা সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায় (বন্দ্যোপাধ্যায় ২১)।

রসসূত্র: ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে নাট্যশাস্ত্রের দান অসামান্য। পরবর্তীকালে রসের ব্রহ্মাস্বাদসহোদরত্ব, চমৎকারিত্ব, লোকোত্তরত্ব প্রভৃতি যে সকল নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা আছে তার মূল হলো ভরতের রসসূত্র।

বিভিন্ন জাতির পরিচয়: ভারতে যে নানা উপজাতির বাস ছিল সে সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্র থেকে জানা যায়। নাট্যশাস্ত্রে আমরা 'কামী, কোশল, বর্বর, অন্ধ্র, আভীর, শবর, শক ও পহলব' বিভিন্ন উপজাতির নাম পাওয়া যায়। 'চণ্ডাল ও যবনের' উল্লেখ ও বিশদ বিবরণ আছে নাট্যশাস্ত্রে। নাট্যশাস্ত্রে প্রসঙ্গক্রমে সেনাপতি, মন্ত্রী, সচিব প্রভৃতির গুণাবলির উল্লেখ আছে। সেকালের রাজার পক্ষের লোককে বিনা ব্যয়ে নাট্যানুষ্ঠান দেখানো মহাবল জনক ছিল বলে মনে করা হয়। তাই আমরা নাট্যশাস্ত্র হতে বিভিন্ন জাতির পরিচয় এবং তাদের কর্মজীবন সম্পর্কেও ধারণা পাই (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২-৩৩)।

নাট্যগণের পরিচয়: উচ্চস্তরের লোকদের নিয়ে ঠাট্টা- তামাসা করতো বলে নাট্যগণ সমাজে হেয় বলে পরিগণিত হতো। 'নট' শব্দের প্রতিশব্দ শৈলুষ, একে বলা হয়েছে জায়া জীব অর্থাৎ যে স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে রেখে জীবিকা অর্জন করে। গণিকারা নটীর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। এর থেকে খুব সহজেই অনুমান করা হয় গণিকাদের সামাজিক মর্যাদা নিম্ন মানের ছিল। কিন্তু নাট্যকলা ছিল আদৃত এবং কলাতিজ্ঞগণ রাজা প্রভৃতির কাছ থেকে সমাদর লাভ করতো (চৌধুরী ১৯-২০)।

অলঙ্কারশাস্ত্রে নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব: অলঙ্কারশাস্ত্র নাট্যশাস্ত্রের বিশেষত এই শাস্ত্রোক্ত রসসূত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট ভরতের নাট্যশাস্ত্রেই প্রথম রসসূত্রটি লিপিবদ্ধ হয় বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী ভাবের। সংযোগে রসনিষ্পত্তি ঘটে। ভরত আটটি রস এবং আটটি স্থায়ী ভাবের ব্যাখ্যা করেছেন। ভরতমুনির মতে, 'শৃঙ্গার থেকে হাস্য, রৌদ্র থেকে করুণ, বীর থেকে অদ্ভুত এবং বীভৎস থেকে ভয়ানক রসের উদ্ভব ঘটে' (বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩-২৪)।

রস কি পদার্থ তা বোঝাতে গিয়ে ভরত মুনি বলেছেন যেমন: 'নানারকম ব্যঞ্জন ঔষধি এবং জিনিসের পরস্পর সংযোগে ভোজ্য রসের নিষ্পত্তি হয়। পুড় প্রভৃতি দ্রব্য, ব্যঞ্জন ও ঔষধির যোগে বাড়বাদি রস তৈরি হয়।' ভরত

মুনির এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যাচ্ছে রস আস্বাদ নয়, রস হলো আস্বাদ্য। আরো সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে রস অনুভূতি নয়, অনুভূতির বিষয়। নাট্যপ্রসঙ্গে ভরতমুনি যে রসের কথা বলেছেন তা কাব্যের ক্ষেত্রের গৃহীত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সহজেই অনুমান করা হয় শুধু গৃহীত নয়, রস কাব্যের আত্মা বলে স্বীকৃত হয়েছিল। ভরতের এই রসের অর্থের প্রাধান্য সকল আলঙ্কারিক গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

আলঙ্কারিক শ্রীরূপ তাঁর গ্রন্থ 'নাটকচন্দ্রিকা' প্রণয়নে যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও শিঙ্গভূপালের রসার্ণবসুধাকর গ্রন্থের অনুসরণ করেছিলেন যেমন:

'বীক্ষ ভরতমুনিশাস্ত্রং রসপূর্বসুধাকরঞ্চ রমণীয়ম্।
লক্ষণমতিসংক্ষেপাদ্ধি লিখ্যতে নাকৈস্যেদম্।'

বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন -
'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম।'
রস যার আত্মা সেই বাক্য কাব্য। তাঁর মতে 'রস ছাড়া কাব্যের অস্তিত্বই নেই' (বন্দ্যোপাধ্যায় ৮-১০)।

উপসংহার: অবশেষে বলা যায় যে, নাট্যকলার চর্চা ও বিস্তারে সংস্কৃত নাট্যকারগণ তাঁদের নাট্যপ্রতিভার দ্বারা বিভিন্ন উৎস থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে কিংবা কাহিনির বীজটুকু নিয়েই বস্তু নির্মাণক্ষম রচনাশৈলীর মাধ্যমে নাট্যকলাকে করে তুলেছেন মহীরুহ সমতুল্য। নাট্যশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র নাট্যকলা অর্থাৎ অভিনয়, শিল্প, নৃত্য, সংগীত, অলঙ্কারশাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বহু তথ্য পাওয়া যায়। ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্য, নাট্য, গীত, ভাষা, বেশভূষা, আচার- ব্যবহার প্রভৃতির চিত্র নাট্যশাস্ত্রে চিত্রায়িত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

চৌধুরী, দর্শন। *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস*। পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫।

নন্দী, ড. সুধীর কুমার । *নন্দনতত্ত্ব*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৯।

প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস*। স্বামী আদ্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরেশচন্দ্র (সম্পাদনা)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র* (১ম খণ্ড)। বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ১৯৮২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫।

ভট্টাচার্য, শ্রী বিষ্ণুপদ। *প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের ভূমিকা*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬০।

কবিরাজ, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত)। *সাহিত্যদর্পণ*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র তর্কবাগীশকৃত (টীকাসহ), ২০১৩।

দাস, পুলিন । *মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ*। উদ্দালক পাবলিশিং হাউস, ১৩৯৮।

বামন (সম্পাদিত)। *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি*। সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩।

বসু, প্রসূন (প্রধান সম্পাদক)। *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*। নবপত্র প্রকাশন, ১৯৫৯।

শিঙ্গভূপাল (সম্পাদিত)। *রসার্ণবসুধাকর*। চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ২০০৪।

শ্রীরূপগোস্বামী (সম্পাদিত)। *নাটকচন্দ্রিকা*। মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (অনূ:), শ্রীরাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।